আজকের কাগজ ১৫৪
তারিখ 13 NOV 1991 পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

'পিতার স্কন্ধে পুত্রের লাশ—এ কেমন পিতা হলাম আমরা'

মজনু—নুল হক

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। নীচু ক্লাসের ছাত্র হিসাবে তখন নবম বা দশম ক্লাসের দোরগোড়ায় আসতে ভয় পেতাম। ভাবতাম তারা আমাদের চাইতে অনেক বড়– একটা সমীহের দূরত্ব বিরাজমান। মনে পড়ে জীবনে প্রথম একজন বিএসসি ছাত্রের দেখা পেয়ে পরম বিস্ময়ে শুধু তার দিকে তাকিয়েই ছিলাম। কিন্তু সাহস করে আলাপ শুরু করতে পারিনি।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া পরম আরাদ্ধ বলে মনে হত। মনে হত যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তারা অন্যরকম মানুষ– তারা ভাল, সব দিক দিয়েই ভাল।

বেশ কিছুদিন আগে কুমিল্লার এক সাংবাদিক বন্ধু বলছিলেন, আগে দেখতাম একজন মুন্সেফকে লোকে কত সম্মান করে, তার চাপরাসী প্রায় নত হয়ে মুন্সেফ গলির মোড় না পেরোনো পর্যন্ত সালাম করতে থাকে। হায় সেসব দিন আজ কোথায়– সাংবাদিকের খেদোক্তি আজও কানে বাজে।

সেসব দিনগুলি কত দ্রুত হারিয়ে গেল। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিতা মাতারা তাঁদের প্রিয় সন্তানদের পাঠাতেন সত্যিকারের মানুষ তৈরীর আশায়– শুধুমাত্র শিক্ষিত করার জন্য নয়। সেসব দিন কোথায় গেল যখন এক বিখ্যাত পিতা (জওহর লাল নেহেরু) বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যাকে পাঠান প্রকৃত মানুষ হওয়ার আশায় এবং সত্যিকার শিক্ষার প্রত্যাশায়, কেননা তাঁর মতে " I dislike the education which prepares a girl to play a part in the drawing room & nowhere else. Personally, if I had the chance I would like to have my daughter work in a factory for a year just as any other worker, as a part of her education."

কোথায় গেল শিক্ষাক্ষেত্রের সেই সততার বাতাবরণ। স্কুল থেকেই শুরু হয়েছে নীতিহীনতার এক অন্ধকার জগৎ। এবারের এস.এস.সি মেধা তালিকা প্রসংগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক চিঠিতে তাই দেখি এক পিতা লেখেন– "(ক) শিক্ষকদের পরামর্শে সেই স্কুলের সেরা ছাত্রটি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে সিকবেডে পরীক্ষা দিয়েছে। (খ) আমার পুত্রের এক অবস্থাপন্ন সহপাঠী এই স্কুলের একজন শিক্ষকের বাড়িতে ব্যাচে পড়েছিল এবং সে জানায় সে শিক্ষক ছয় ব্যাচে ১২০ জন ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে মাসে ৯৬ হাজার টাকা উপার্জন করেন। আবার প্রাইভেট টিউশনি করি না এই অঙ্গীকারনামা দিয়ে তিনি তাঁর বিষয়ে একজন প্রধান পরীক্ষক।"

যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গর্ব, যাকে এক সময়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হত আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে জ্ঞান বিতরণের অন্যতম পাদপীঠ?, পত্র–পত্রিকায় জানতে পারি একজন প্রাক্তন উপাচার্য– 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকাতদের গ্রাম'– এই মন্তব্য করেছেন। সেদিন আলাপচারিতায় এক অধ্যাপক বলছিলেন– "আর্মড ক্যাডারের এক ছাত্রনেতা আমায় বলেছে তাদের কাছে এখন এমন সফিসটিকেটে আর্মস আছে যা' পুলিশের কাছেও নেই।" তাদের কাছে আধুনিক অস্ত্র আছে এটাতে আমি তেমন বিস্মিত হইনি। কিন্তু ব্যথিত হয়েছি এই ভেবে কেমন অজান্তে আমরা ছাত্রদের মধ্যে আর্মড ক্যাডারের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলাম। যেন এটাও সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর মতনই আইনসিদ্ধ কোন প্রাতিষ্ঠানিক দল।

আজকে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে যেতে ভয় পাই আমরা সবাই। "যান" বা "জান" দুটোই বিপদগ্রস্ত হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এসব এলাকায়– বিদ্যা চর্চার অঙ্গনে চাঁদা তোলা আর ছিনতাই–এর ঘটনায় দেশবাসী লজ্জিত। একটি পত্রিকায় দুঃখ করে বলা হয়েছে– "চলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাস্তা বন্ধ নোটিশ চোখে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি বাংলাদেশের বাইরে কোন একটি পৃথক রাষ্ট্র যেখান দিয়ে নাগরিকরা গাড়িতে চলাচল করতে পারবে না? কিংবা প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হবে? দেশের আইন–কানুন কি এখানে প্রযোজ্য নয়?" –কে দেবে এর উত্তর?

একজন ছাত্রনেতা একবার বলেছিলেন– আমরা কি করব– আমাদের হাই কমান্ডের আদেশ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চালাও, আমরা তাই করছি। কি অদ্ভুত কথা। আমার স্ত্রী সন্ধ্যার পর কলেজের পাশ দিয়ে হাঁটতে ভয় পান– কেন? এই সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলির খবরে অনেক আতংকিত পিতামাতাই আমায় ফোন করে জানতে চেয়েছেন তাদের ছেলেমেয়েরা নিরাপদে আছে কিনা, খোঁজ নিয়ে যেন জানাই টেলিফোনে। এক মা কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। একেমন দেশ হল আমাদের। যেদেশে শিক্ষাঙ্গনে ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য পিতামাতারা কাঁদেন।

এদেশের একজন নাম করা কবি বলছিলেন দুঃখ করে– "দেশ–দেশ করে ছুটে এলাম বিদেশ থেকে। সেই দেশের শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা দেখে নিদারুণ হতাশ হয়ে পড়েছি। আমি তো ঠিকই করে ফেলেছি আমার ছেলেমেয়েরা ইন্টারমিডিয়েট পাস করলেই বিদেশে পাঠাব পড়তে– ইউরোপ–আমেরিকা না হলে অন্ততঃ ভারতে।" দরিদ্র আমি ভাবি; আমি কি করব। আমার তো ভারতে পড়ানোর সামর্থও নেই। তা' হলে? এ' প্রশ্ন আমি কার কাছে করব?

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড– এ' আপ্ত বাক্যটি স্কুল জীবন থেকেই শুনে আসছি। আজকে শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা দেখে যে কেউ বলতে পারবে সে মেরুদণ্ডের কি হাল করেছি আমরা। তা' হলে কি মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপে পরিণত হচ্ছি আমরা?

ঢাকা যেমন সমস্ত বাংলাদেশ নয়– বাংলাদেশটাও তেমনি সমস্ত পৃথিবী নয়। আমরা এই আপাতঃ সরল সত্যটি বার বার ভুলে যাই নিজেদের স্বার্থে। দলের উপরে দেশ বড়– সে কথা বার বার উচ্চারিত হয় বটে কিন্তু আচরণে তা' প্রতিবিম্বিত হয় না। আর হয় না বলেই কাজে ও কথায় কোন মিল খুঁজে পাই না।

কাকে দোষ দেব? একে অন্যকে দোষারোপ করছেন– পথ ও পন্থা নির্দেশ করছেন। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি। আমি দোষ দিই আমার ভাগ্যকে।

আমি এক হতভাগ্য পিতা। সন্তান আমার কাছে বধির। তাদের নাকি গডফাদার/গডমাদার আছেন– তারই নির্দেশে তারা চলে। আমার সন্তান আমার কাছে অচিন। আমি এবং আমার মত নির্বোধ দুঃখী পিতারা এবং মাতারা অসহায় হতাশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আমারই শ্রমে এবং স্বেদে কেনা অস্ত্রে তারা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে। যে খুনী সে আমার সন্তান, যে নিহত সেও আমারই সন্তান। কি নিদারুণ অভিশপ্ত আমি।

কত প্রত্যাশায় একাত্তরের স্বাধীনতা এল। ভাবলাম এবার আমাদের রাহুমুক্তি হবে। কিন্তু কি নিদারুণ আঘাতে আমাদের স্বপ্নের সৌধ ভেঙ্গে পড়তে লাগল। তারপর পঁচাত্তর এল– সর্বোপরি নব্বই–এর গণঅভ্যুত্থান। আমরা বার বার সংগ্রাম করি নতুন দিন ছিনিয়ে আনব এই প্রতিজ্ঞায়। কিন্তু অল্পদিনেই সেই স্বপ্ন পদদলিত হতে থাকে। আমরা বিস্ময়ে দেখছি কি করে রাতারাতি কালো তালিকা সাদা হয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত আমরা হেরে যাচ্ছি আমাদের অঙ্গীকারের কাছে।

একবার– শুধু হে খোদা, শুধু একবার আমাদের সেই নেতৃত্ব দাও যা নিজের স্বার্থ দেখবে না– চিনবে না– যার দৃষ্টি থাকবে অগণিত আশাহত দেশবাসীর দিকে। একবার রাজা হলে যিনি পরবর্তীতে রাজা হতে চাইবেন না– আমরা সেই নির্মোহ রাজা চাই।

সব দেশেই ক্ষমতাবানদের বন্ধু জোটে খুব দ্রুত। অসংখ্য সেই বন্ধুরা রূঢ় বাস্তবতা থেকে নেতাদের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে চান। প্রার্থনা করি নেতারা যেন ভলতেয়ারের মতনই বলতে পারেন– "Lord, save me from my friends. As for my enemies, I myself can take care of them."

রাত্রি যতই গভীর হয় ভোর ততই নিকটে– আমাদের আশার কথা সেটাই।

মজনু–নুল হক : গল্পকার, প্রকাশিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ– "বিলেতে বাংলার যুদ্ধ"।